ছদ্ম নির্যাতনের শিকার নারীরা

আবুল কালাম বিশ্বাস

সন্তান ধারনের সিদ্ধান্ত নব-দম্পত্তির জন্য একটি অতীব সেনসিটিভ সিদ্ধান্ত। রত্না ও ফরহাদ এ বিষয়ে পরস্পরের মতামতের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল তা তাদের কথাবার্তায় স্পষ্ট। কেউ কাউকে চাপ দিচ্ছেন না। তবে রত্না বুঝতে পারেন যে তার স্বামীর মনোভাব হলো দ্রুতই সন্তান নেয়া। যদিও রত্নার পরীক্ষা, চাকরীর জন্য প্রস্তুতি ছাড়াও শারীরিক মানসিক অবস্থা চিন্তা করলে তার সন্তান ধারন আরও কমপক্ষে তিন/চার বছর পরে হলেই তার জন্য উত্তম হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো-তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ইচ্ছা (যদিও প্রকাশ্যে নয়) এবং স্বামীর ইচ্ছা আকারে ইঙ্গিতে যা বোঝা যায়, তা দ্রুতই বাচ্চার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। এসবের কোনোটিই রত্নার পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়।

হালিমা বেগমের তিন ছেলে-মেয়ে। দুই মেয়ের পরে ছোট ছেলেটি। হালিমা তার তিন সন্তানকেই সমান চোখে দেখেন। আদর-স্নেহ, সেবা-যত্ন কারো প্রতি কোনই কমতি নেই। তারপরেও তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি আত্মীয়-স্বজন এমনকি স্বামীর কাছ থেকেও ছোট ছেলের প্রতি একটু বেশি যত্নশীল হওয়ার ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন, যা তার কাছে মোটেও ভালো লাগে না। নিজের সন্তানদের প্রতি সমান মনোযোগ দিতে পারবেন না, আবার সন্তানদের মধ্যে যার সাথে তার মানসিকতা বেশি মেলে তার প্রতি ন্যূনতম স্নেহাধিক্য থাকবে না, বরং জোর করে অন্য কারো ইচ্ছায় কাউকে বেশি ভালোবাসতে হবে।

জাহানার খাতুনের তিন ছেলে-মেয়ে। প্রথম দুই ছেলে ও মেয়ে চাকরি করেন আর ছোট ছেলেটি করেন ব্যবসা। সবার অবস্থাই মোটামুটি ভালো। সবাই আলাদা আলাদা বাড়িতে নিজ সংসার নিয়ে বসবাস করেন। স্বামী মোজাফফর আহমেদকে নিয়ে জাহানারা খাতুন গ্রামের ভিটেবাড়িতে থাকেন। বাবা-মাকে দেখাশুনার ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের চেষ্টা রয়েছে। সবাই তাদের খোঁজ-খবর নেন, কাপড়-চোপড়সহ মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠান। কিন্তু তারপরেও জাহানারা খাতুনের আফসোস তার সাথে কোনো ছেলে-মেয়ে সময় নিয়ে মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পরিকল্পনার বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করেন না। জাহানারা খাতুনের আপন বোন রহিমা খাতুন জটিল রোগে ভুগছেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্বেও নিজের আপন ছোট বোনকে চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারছেন না। নিজের স্বামী সন্তানদের নিয়েও জাহানারা খাতুনের ইচ্ছে হয় - সকলকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান করার-কিন্তু ছেলে-মেয়েরা নিজেদেরকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে মা-বাবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা শোনার তাদের সময়ও নেই। তাই দান-খয়রাত, সাহায্য-সহযোগিতা, পোষাক-আষাক, খাবার-দাবার ইত্যাদি অনেক বিষয়েই জাহানারা খাতুনকে পরিস্থিতি মেনে নিয়ে চুপ থাকতে হয়, যা তার কাছে অসহনীয় লাগে।

রান্নাবান্নার বিষয়ে আফরোজাকে সবসময় পরিবারের অন্য সদস্যদের পছন্দ অপছন্দকেই প্রাধান্য দিতে হয়। স্বামী সন্তানদের পছন্দের সব আইটেমই রান্না করতে হয়। কিন্তু তার নিজের পছন্দের আইটেমের কথা কেউ কোনদিন খোঁজই নেয় না; এমনকি স্বামী সুলতান সাহেবও না। বেলেম্বু দিয়ে ছোট পুঁটি মাছের ঝোল তরকারি মনে হয় সে ছয় মাসের বেশিকাল খায়নি, কিন্তু স্বাদ তার জিহবায় সর্বদা লেগে আছে। ছোটবেলায় মা তাকে বিশেষ এক ধরনের ঝোল পিঠা খাওয়াত যার স্বাদও সে ভুলতে পারে না। কিন্তু আজ পাঁচ বছরেরও বেশি কাল তার সেটা খাওয়া হয়না। এমনি আরও কত প্রিয় খাবারের পছন্দ তাকে ছাড় দিতে হয় নিজের পরিবারের কাছেই।

নাসিমা আক্তার সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বেসিক ট্রেনিংসহ পদোন্নতি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে কয়েকধাপ পদোন্নতিও পেয়েছেন। সবাই জানেন তিনি একজন দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। কিন্তু জানা এবং তদনুযায়ী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নাসিমা তার প্রতি এক অদৃশ্য বৈষম্য লক্ষ্য করেন। গুরুত্বপূর্ণ পেশাদারিত্বের ভাইটাল পোষ্টিং এর ক্ষেত্রে নাসিমাকে কখনো বিবেচনা করা হয় না। নারী বলে তার প্রতি একধরনের অবমূল্যায়ন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার প্রতি করেন, নাসিমা বুঝতে পারেন। এমনকি কম গুরুত্বপূর্ণ পোষ্টিং পেয়েও তিনি যখন সৃজনশীল উন্নত সেবা প্রদানের মতো উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন, যাতে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সেবাগ্রহিতারাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তখনও কিছু উল্লেখযোগ্য সহকর্মী নাসিমার ভালো উদ্যোগগুলোর নেতিবাচক দিক খুঁজতে তৎপর হয়ে পড়েন এবং তাকে থামানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকেন যা নাসিমার ব্যক্তিত্বের প্রতি চরম চপেটাঘাত।

সুলতানা পারভীনকে অফিসে বস ও কলিগদের বাজে নজর থেকে রক্ষা পেতে চরম বৈরি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এমনকি বোরকা পরে থাকলেও তার প্রতি সহকর্মীদের কুদৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গি, ইশারা-ইঙ্গিত তার জন্য চরম বিব্রতকর। তিনি পারছেন না প্রতিবাদ করে বসকে শাসাতে; না পারছেন কারো কাছে অভিযোগ করতে! পরিস্থিতি চূড়ান্ত খারাপ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে কষ্ট করে মানসিক নির্যাতন সহ্য করে বিব্রত হওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হচ্ছে! বিবাহিতা এবং সন্তানের মা হয়েও যদি তাকে এরকম আচরণের শিকার হতে হয়, তবে অবিবাহিত স্মার্ট আধুনিক নারীরা কিভাবে অফিস করবেন? যারা তার সাথে এমন নোংরা আচরণ করেন, তারা কি মেনে নিতে পারবেন তাদের স্ত্রী কন্যার সাথে এমন আচরণ অন্য কেউ করুক?

জেবা পড়াশোনা করে নবম শ্রেণিতে। অষ্টম শ্রেণিতে প্রত্যাশিত ভালো রেজাল্ট করে নবম শ্রেণিতে ভর্তির সময় বিজ্ঞান, বাণিজ্য না মানবিক-কোন বিভাগে সে পড়বে- এটা নিয়ে এক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মূখীন হতে হয়। তার নিজের পছন্দ পৌরনীতি তথা রাষ্ট্র বিষয়ক পড়ালেখা। কিন্তু বাবা-মা চায় সে ডাক্তার হবে! ডাক্তারী পেশাটা তার একদম ভালো লাগে না। রোগ-ব্যাধি নিয়ে কাজকর্ম তার মোটেই পছন্দ নয়। সে রোগ-ব্যাধিকে ভয় পায়! কিন্তু বাবা-মাকে কিভাবে বোঝাবে? পরিবারে রীতিমত কান্নাকাটি আর হূলস্থুল অবস্থা। শেষ পর্যন্ত দফারফা হয় বানিজ্য বিভাগে পড়ার সিদ্ধান্তে; যদিও এই বিভাগও জেবার ততটা পছন্দ নয়। তবু চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা আরকি! জেবার নিজের ইচ্ছার মৃত্যু ঘটিয়ে করে বাবা-মার ইচ্ছায় নিজেকে মানিয়ে নিয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

নারীর প্রতি প্রকাশ্য নির্যাতনের পাশাপাশি আছে নারীর ওপর ছদ্ম নির্যাতন। এসব নির্যাতনের কিছু মিডিয়াতে আসে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ হয় সর্বত্র। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের এসব ঘটনা পুরুষের বাহাদুরীতে পরিণত হয়ে হারিয়ে যায় নারী শরীরের ক্ষত হয়ে! প্রকাশ্য নির্যাতনের বাইরেও নারীর প্রতি এক ধরনের ছদ্ম নির্যাতনও কেবলই নারীর দীর্ঘশ্বাস কিংবা বোবাকান্না হয়ে মিলিয়ে যায় আকাশে বাতাসে।

এমনিভাবে কেরিয়ার, বিয়ের পাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি টেলিভিশনের চ্যানেল দেখার মতো ইত্যাদি ছোট-খাট বিষয় থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েও নারীরা প্রতিনিয়ত নিজের মনের বিরূদ্ধে অন্যের চাওয়ার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে জীবন যাপন করে চলেছেন। নিজের স্বকীয়তাকে নির্বাসন দিয়ে অন্যের ইচ্ছার কাজে নিজেকে সঁপে দেয়ায় যেন নারীর অমোঘ নিয়তি! কাছের মানুষের দ্বারাই নারীরা এই ছদ্মনির্যাতনের শিকার বেশি হয়ে থাকেন। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী, বস-সবার কাছ থেকেই নারীরা কমবেশি এমন অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিরি সম্মূখীন হন, যা থেকে মুক্তির জন্য নারীদের আত্ম-সচেতনতার পাশাপাশি সকলেরই সহযোগিতা একান্ত দরকার।

গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বেড়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। নারীর প্রতি মানসিক নির্যাতনের প্রভাব অত্যন্ত সুদুরপ্রসারী, যা একটি দেশের উন্নয়নে পথে অন্তরায়। এ মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যাক্তি পর্যায় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে কাঠোর শাস্তি দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল রয়েছে। নির্যাতিত নারীরা এ সেলের মাধ্যমে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকেন। এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, দক্ষ বিচারক দ্বারা ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নির্যাতিত নারীরা নিজ জেলা থেকে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেতে পারেন। জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়া যায়।

সরকারের এসব উদ্যোগের ফলে দেশের নির্যাতিত, অবহেলিত নরীরা ইতিমধ্যে সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। সরকারি সেবাসমূহ প্রতিটি মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত সরকারি সেবা গ্রহণ করা এবং অন্যায়, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

-০০-

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)